আজকের কাগজ 36
তারিখ ..28. FEB..1994
পৃষ্ঠা 8 কলাম

এস, এস, সি পরীক্ষা ও কিছু ভাবনা

মিলা মাহফুজা

১৯৯৪ সালের এস, এস সি পরীক্ষা শুরু হবার আর তিন মাসও দেরি নেই। দীর্ঘ দশ বছর লেখাপড়া করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রথম একটি সার্টিফিকেট পাবার জন্যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। নিজের স্কুলের বাইরে গিয়ে পরীক্ষা দেবার অভিজ্ঞতা হয় অনেকেরই প্রথম বারের মত। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভবিষ্যৎ জীবনে লেখাপড়া, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বহু বিষয় জড়িত বলেও এর গুরুত্ব অনেক। ফলে স্বভাবতই পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কিছুটা টেনশন থাকে।

ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ প্রবণতা হলো সবচেয়ে ভাল ফলাফল করা। এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্যে তারা তাদের মেধা আর শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ করবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু সম্প্রতিকালে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মেধা আর শ্রমের প্রশ্নে এক অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন আর কেবল একজন শিক্ষার্থীর মেধা আর শ্রম ফলাফলের জন্যে একমাত্র উপাত্ত বিষয় নয়। শিক্ষার্থীর পরিবারের আর্থিক অবস্থাও এখানে এক বিরাট ভূমিকা রাখছে।

অতীতে এ দেশে টোল প্রথা চালু ছিল। সেই টোলের পন্ডিত একজন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে যে মূল্যায়ন করতেন সেটাই সবার জন্যে গ্রহণযোগ্য হত। আস্তে আস্তে টোলপ্রথা উঠে গিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা আর শিক্ষার্থীর মান নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। সেটাই এখন শিক্ষা বোর্ড নামে পরিচিত। এই শিক্ষা বোর্ড একটি নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে অভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কাজের সুবিধার জন্যে দেশের সমগ্র অঞ্চলকে ভাগ করা হয়েছে চার ভাগে। চারটি শিক্ষা বোর্ড আলাদাভাবে অথচ একই নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছে।

প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি ক্লাসের জন্যে নির্দিষ্ট বই আর সিলেবাস নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সিলেবাস প্রতিটি স্কুলে অবশ্যই পড়াবার নিয়ম রয়েছে। আবার বছর শেষে নির্দিষ্ট নিয়মে পরীক্ষা নেবার এবং তারই ভিত্তিতে ওপরের ক্লাসে ওঠাবার নিয়ম ও রয়েছে।

এ হলো সরল অংকের হিসেবের মত। সব কিছু ঠিকঠাক মত করলে ফল মিলবেই। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। কোথাও যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে। ফল সবার একরকম হচ্ছে না। প্রশ্ন ওঠতে পারে, শিক্ষার্থীর মেধার মানের, কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়। গোল বেধেছে অন্যখানে।

সব স্কুলের শিক্ষার মান এক রকম নয়। 'মান' কথাটার ব্যাখ্যার দরকার নেই, কেননা সাধারণ মেধার লোকও এই 'মান' জিনিসটি সহজেই বোঝেন।

প্রায় প্রতিটি শহরে দু-একটি স্কুল ভালো স্কুল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই স্কুলগুলোতে বছরের প্রথমে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন দেখে মনে হয় ছাত্রের চাইতে স্কুলের আসন সংখ্যা কম। বস্তুত তা নয়, বিশেষ কয়েকটি স্কুল ছাড়া এই ভিড় অন্যান্য স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ভালো হচ্ছে সেই সব স্কুল, যাদের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ভালো। অর্থাৎ এস, এস, সি'তে যে সব স্কুলের ছাত্র স্ট্যান্ড করছে। এসএসসি'র ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে গতকয়েক বছর ধরে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটছে। কোন একটা স্কুল এক একবার মেধা তালিকার অধিকাংশ স্থান দখল করে নিচ্ছে। কিভাবে এটা সম্ভব বোধগম্য নয়। এ বিষয়ে কোন তদন্ত হয়েছে কি-না আমার জানা নেই। তবে এ নিয়ে একেকজন একেক রকম মন্তব্য করেন। কেউ বলেন ওইসব স্কুলের শিক্ষকরা এস, এস, সি'র প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন। কেউ বলেন, ওইসব স্কুলের ছাত্রদের খাতা পরীক্ষা করার সময় কারচুপি করা।

এভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা সত্ত্বেও ঐ সব ছাত্রদের সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণা থেকেই যায় বস্তুত: এখন ছাত্ররা অভিভাবক আর শিক্ষকদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। এখন ছাত্রের মেধার মান নির্ভর করছে প্রথমে অভিভাবকদের অভিলাষ আর তারপরে অর্থের উপর। একেবারে শিশু বয়স থেকে প্রাইভেট টিউটর বা গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে কোমলমতি ও সৃষ্টিশীল সব ছাত্রদের নির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। স্কুলের পড়ার বাইরে গৃহশিক্ষক তাদের জন্যে প্রশ্নে উত্তর তৈরি দিচ্ছেন। শিক্ষার্থীর কাজ কেবল তা গলধঃকরণ করা এবং যথাসময়ে উগরে দেখা। শিশু শ্রেণী থেকে সিলেবাস-এর নামে সংক্ষিপ্ততম কোর্স চালু করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট এই পড়াশোনা করার জন্যেও শিক্ষার্থীকে এখন আর মাথা খাটাতে হচ্ছে না। কেবল মুখস্ত করার অভ্যাসটুকু থাকলেই হবে।

ছেলেকে ক্লাসে প্রথম হতেই হবে, এরকম এ মনোভাব থেকে এক শ্রেণীর অভিভাবক মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। প্রথম শ্রেণীতে পড়ুয়ার জন্যে এম,এ পাস গৃহশিক্ষক রাখেন।

শিশুরা ধাপে ধাপে শিখতে শিখতে উঁচু ক্লাসের দিকে এগুবে, এটাই সঠিক নিয়ম। ইদানিং কালে গৃহ শিক্ষকের কল্যাণে প্রাইমারী পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর পত্র দেখে স্বস্তি হতে হয়। শিক্ষার্থীকে গৃহশিক্ষক তার মেধা আর মনন কাজে লাগিয়ে এক অতি উচ্চমানের উত্তর তৈরি দেন। শিক্ষার্থী না বুঝেই তা মুখস্ত করে, পরে পরীক্ষার খাতায় উগরে দেয় এবং ভালো ফলাফল পেয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, উত্তরের মান নিয়ে। একটি প্রশ্নের উত্তরের মান হবে শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণী উপযোগী। স্বাভাবতই নিচু ক্লাসের একজন ছাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর যেভাবে লিখবে, উঁচু ক্লাসের একজন ছাত্র একই প্রশ্নের উত্তর লিখবে আরো সুন্দরভাবে, বর্ধিত আকারে। একইভাবে দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র এবং এম, এ ক্লাসের একজন ছাত্রের উত্তর পত্রের মধ্যেও মানের তারতম্য থাকবে। কিন্তু গৃহশিক্ষকদের কল্যাণে এখন দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র-ই একজন এম এ ক্লাসের ছাত্রের মতই প্রশ্নোত্তর করে থাকেন। কেউ কেউ হয়ত বলবেন ছাত্রদের লেখাপড়ার মান বেড়েছে, ব্যাপারতো সত্যি হলে আপত্তি ছিল না। বরং উল্টোটাই ঘটছে গৃহশিক্ষক নির্ভর এই প্রজন্ম পরবর্তীকালে এধরনের মানের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

আমাদের ছাত্রজীবনে গৃহশিক্ষক রাখা হত সেই সব ছাত্রের জন্যে যারা পড়াশোনায় খারাপ করতো। দুষ্ট আর ডান পিটে ছেলেদের জন্যেও গৃহশিক্ষক রাখা হত।

গৃহশিক্ষক ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। এখন তো গৃহশিক্ষক ব্যবস্থা অন্য রূপ নিয়ে বিকশিত হচ্ছে। কোচিং সেন্টার নামে স্কুলের পাশাপাশি আরো একটি স্কুল চালু হয়েছে। ছয় ঘন্টা স্কুলে কাটাবার পর ছাত্ররা ছুটছে কোচিং সেন্টারে। নিজস্ব নিয়মে এখানে পড়াশোনা করানো হয়। কোন কোন কোচিং সেন্টারে একটা স্কুলের চাইতে বেশি ছাত্র পড়াশোনা করে। এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি'র ফলাফল প্রকাশের পর এসব কোচিং সেন্টার পূর্ণ আড়ম্বরে সাফল্য উৎসব পালন করে। লটারী করে ঢাকা-কাঠমন্ডু-ঢাকা-বিমানের টিকেট দেয়। এক বিদেশি ভদ্রলোককে একদিন চেষ্টা করেছিলাম এই গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টার বিষয়টাকে বোঝাবার জন্যে। দেশের ও নিজের মান বাঁচাতে বহু চেষ্টা করলাম বুঝিয়ে বলার সব শোনার পর তিনি বললেন, 'আসলে তোমাদের স্কুলের দরকার নেই। স্কুলগুলো তুলে দিয়ে কোচিং সেন্টার-ই ভালো করে চালু কর।'

আসলেই তো তাই যদি স্কুলে পড়াশোনা নাই হবে, তবে স্কুল রাখবার দরকার কি? স্কুল এখন ধারা বাহিকতা বজায় রাখা ও পরীক্ষা দেবার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। স্কুল শিক্ষকদের ব্যাপক হারে গৃহশিক্ষকতা শুরু হবার ফলে স্কুলগুলোতে পড়ানো হচ্ছেই না, বলা চলে। সরকারি স্কুলগুলোতে এ অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। এসব স্কুলের শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতার আয় কল্পনাতীত। ফলে তারা কেবল নিয়ম রক্ষার্থে স্কুলে যান। অভিযোগ আছে শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে ক্লাসের কারণে বেশির ভাগ সময়ই অকারণে ছাত্রকে নাজেহাল হতে হয়। পরীক্ষার ফলাফলও আশানুরূপ হয় না।

এই গৃহশিক্ষক ব্যবস্থা এক ভারী পাথরের মত চেপে বসেছে অভিভাবকদের কাঁধে। যে সব অভিভাবক চান না তাদের ছেলেমেয়ে গৃহশিক্ষক নির্ভর হোক, তারা খুবই অসুবিধার মধ্যে আছেন। তাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে অবহেলিত হচ্ছে। গৃহশিক্ষক বা কোচিং স্কুলের খরচ মেটাবার সামর্থও সব অভিভাবকের নেই। কেউ কেউ বাধ্য হচ্ছেন অন্য পথ অবলম্বনে।

শুরু করেছিলাম, এস, এস, সি পরীক্ষা নিয়ে। সেখানেই ফিরে যাই। এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্যে এখন পরীক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরীক্ষায় মেধা তালিকায় নাম রাখতেই হবে এমন ক্রেজি অভিভাবক সন্তানের জন্যে চান ৮/৯ টি পর্যন্ত গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেছেন। স্কুলের শিক্ষকদের এখন স্কুলে যাবার সময়ের বড় অভাব (ব্যতিক্রমীরা ক্ষমা করবেন আমাকে), তাদের এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। কোন কোন অভিভাবক এখনও দৌড়াচ্ছেন ছেলেমেয়ের জন্যে নোট সংগ্রহে (এটি একটি নতুন ফ্যাশন)।

তবে সব ঘটনারই ব্যতিক্রম আছে। এখনও কেউ কেউ আছেন যারা ছাত্রদের ঠিকভাবে শিক্ষাদিচ্ছেন। কোন কোন ছাত্রও আছে যারা নিজের মেধাকে ব্যবহার করে ভালো ফলাফল করতে চায়। এসব ছাত্রদের মধ্যে একটা হতাশা কাজ করছে, তা হলো চিহ্নিত স্কুলগুলো ভর্তি হবার সুযোগ না পাওয়ায় তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হতে পারে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন না যাতে কোন একটি স্কুলের ২৭টি মেধা তালিকা দখল করার মত অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক ঘটনা আর না ঘটে।

ক্যাডেট কলেজগুলোর ছাত্রদের পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থাও সংগত নয়। একই দেশের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আলাদাভাবে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকার কারণে তাদের ফলাফল ও সন্দেহজনক মনে হয়। আর সত্যিই তো নিজস্ব পরিবেশে পরীক্ষা দেবার প্রাথমিক সুযোগটুকু তারা পাচ্ছেই, অন্যায় ভাবেই।

এসব ছাত্ররাই আগামী দিনের নাগরিক। তাদের গড়ে তোলার দায়িত্ব সমাজের সকলের। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে বর্তমান প্রজন্ম সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। আশা করছি এবার এস, এস, সি'র ফলাফল বৈষম্যমূলক হবে না।

মিলা মাহফুজাঃ প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।